রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রধান উদ্বেগগুলোর বিবর্তন

বিস্তারিত প্রথম পৃষ্ঠায়

ক্যাম্পে ওষুধ প্রদান করার ব্যবস্থাপত্র বা প্রেসক্রিপশন

বিস্তারিত নবম পৃষ্ঠায়

যেভাবে রোহিঙ্গা শরণার্থী অনুপ্রবেশের শুরু থেকে এ পর্যন্ত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রধান উদ্বেগগুলো বদলেছে

জানুয়ারি ২০১৮ থেকে ২০১৯ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত রোহিঙ্গা জনগণের প্রধান আশঙ্কার বিষয় ছিল ত্রাণ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা। সমস্যাগুলোর মাঝে ত্রাণ কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা ছিল প্রধান। জানুয়ারি ২০১৮ থেকে মে ২০১৯ পর্যন্ত ত্রাণ কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা ক্রমশ বেড়েছে, যা মে ২০১৯ এ সবচেয়ে বেশি ছিল।

২০১৮ সালের শেষের দিক থেকে পরবর্তী কয়েক মাস গ্যাস স্টোভ এবং তৎসংশ্লিষ্ট সেবাসমূহ বিষয়ক আশঙ্কা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে, কিন্তু রান্নার জালানি সংক্রান্ত আশঙ্কা কমতে শুরু করেছে।

শেল্টার মেরামত করা জনিত আশঙ্কা বর্ষাকাল আসার আগে ২০১৮ ও ২০১৯ এ দুই বছরেই বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে আশঙ্কা বেশি ছিল।

অক্টোবর থেকে জানুয়ারি মাস, এ শুষ্ক মৌসুমে ক্যাম্পে পানির অপ্রাপ্যতা বিষয়ক আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়।

যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ২৮ × বুধবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯

২০১৭ সালের আগস্টে কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থী অনুপ্রবেশের শুরু থেকে, বিভিন্ন সংস্থা ক্যাম্পগুলোতে বাসরত রোহিঙ্গা জনগণের কাছ থেকে তাদের বিভিন্ন উদ্বেগ সম্পর্কে মতামত সংগ্রহ করতে থাকেন। বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এই মতামতগুলো একত্রিত এবং বিশ্লেষণ করে, তাদের অগ্রাধিকার ও উদ্বেগগুলো চিহ্নিত করে *'যা জানা জরুরি'*-এর বিগত ২৭টি ইস্যুতে তা প্রকাশ করে আসছে। রোহিঙ্গা শরণার্থী অনুপ্রবেশের শুরু থেকে দুই বছর পরে রোহিঙ্গা জনগণের অগ্রাধিকার ও উদ্বেগগুলো সময়ের সাথে কীভাবে পরিবর্তন হয়েছে তা বুঝতে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত সকল তথ্য পুনরায় বিশ্লেষণ করেছে।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রধান উদ্বেগগুলো

খাদ্য, খাদ্য ভিন্ন অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী, রান্নার জ্বালানি ও অন্যান্য উপকরণ, শেল্টার, পানি, ল্যাট্রিন, সাইটের নানাবিধ সুবিধা যেমন রাস্তাঘাট ও রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা নিয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে উদ্বেগ রয়েছে। প্রায় সকল ক্যাম্পেই, রান্না এবং শেল্টারের পর সবচেয়ে বেশি মতামত এসেছে ত্রাণসামগ্রী বিষয়ে।

চিত্র ১: জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রধান উদ্বেগসমূহ (৬৪,৮৪৪ জন)

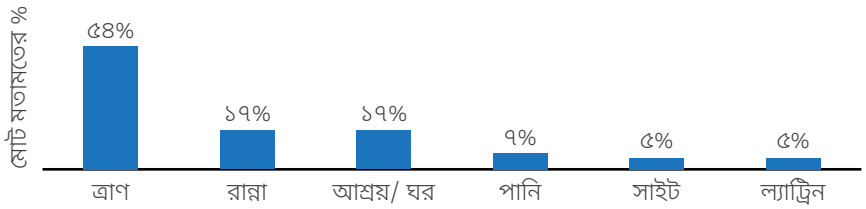

ত্রাণ সম্পর্কিত উদ্বেগ সমূহ

ত্রাণ-সম্পর্কিত সমস্যাগুলো প্রতিনিয়ত রোহিঙ্গা নারী-পুরুষদের জন্য উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ত্রাণ কার্ড সংক্রান্ত সমস্যাই প্রধান এছাড়া অন্যান্য যে বিষয়গুলো নিয়ে প্রায়ই উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় সেগুলো খাদ্যের মান সম্পর্কিত এবং খাদ্য ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্য যেমন হাইজিন কিট প্রাপ্তি সংক্রান্ত।

২০১৮ এর শুরু থেকেই ত্রাণের কার্ড নিয়ে মানুষ বিভিন্ন অভিযোগ করে আসছেন, কিন্তু কার্ড সংক্রান্ত মতামতের সংখ্যা বিগত ১৭ মাসে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সংক্রান্ত যে সকল অভিযোগ বা সমস্যার কথা জানা যায় তার মধ্যে আছে কার্ড না পাওয়া, কার্ড হারিয়ে যাওয়া এবং কীভাবে নতুন কার্ড নেয়া যায় সে সম্পর্কে না জানা এবং বর্তমান কার্ডে পরিবারের অতিরিক্ত বা নতুন সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা। কিছু লোক এটাও জানিয়েছেন যে, তাদের ত্রাণ কার্ড থাকা সত্ত্বেও তাদের টোকেন পেতে সমস্যা হচ্ছে।

পুরো ২০১৮ সাল জুড়ে, মানুষ এফ.সি.এন কার্ড, এম.ও.এইচ.এ কার্ড এবং ডব্লিউ.এফ.পি কার্ড সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার কথা জানিয়েছেন। আগস্ট থেকে অক্টোবরের মধ্যে কার্ড সংক্রান্ত উদ্বেগ সবচেয়ে বেশি ছিলো (ছক ৩ দেখুন)। ২০১৯ সালে, মানুষ যৌথ নিবন্ধন কার্ড ও স্কোপ (SCOPE) কার্ড নিয়ে বিভিন্ন সমস্যার কথা জানিয়েছেন। রোহিঙ্গা জনগণ প্রায়ই যৌথ নিবন্ধন কার্ডকে স্মার্ট কার্ড বলে থাকে। এই বছরে, মানুষ এফ.সি.এন কার্ড নিয়ে তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন।

মোট প্রাপ্ত মতামতের মধ্যে কার্ডের বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত মতামতের সংখ্যা ২০১৯ সালের মে মাসে বৃদ্ধি পেয়ে ৬২% এ উন্নীত হয়। এটা স্পষ্ট নয় যে কেন হঠাৎ করে মে মাসে কার্ড-সংক্রান্ত সমস্যার সংখ্যা বেড়ে গেল, কারণ সেখানে যে সকল সমস্যার কথা জানানো হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশই বিগত মাসের সমস্যাগুলোর অনুরূপ। নতুন সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে স্বামীর কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর নারীদের পৃথক সহায়তা কার্ড (স্কোপ কার্ড) চাওয়া। কিছু মানুষ অভিযোগ করেন যে তারা রেড ক্রসের কার্ড পেয়েছেন কিন্তু সেই কার্ড দিয়ে কোনো ত্রাণ পাননি।

> “কয়েক মাস আগে, আমরা চাঁদ-তারা (রেড ক্রস) কার্ড পেয়েছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই কার্ড থেকে কিছুই পাইনি।”
>
> – পুরুষ, ক্যাম্প ১২

চিত্র ২: যারা ত্রাণ সংক্রান্ত সমস্যার কথা বলেছেন তাদের মাঝে শতকরা কতজন কার্ড সংক্রান্ত সমস্যার কথা বলেছেন

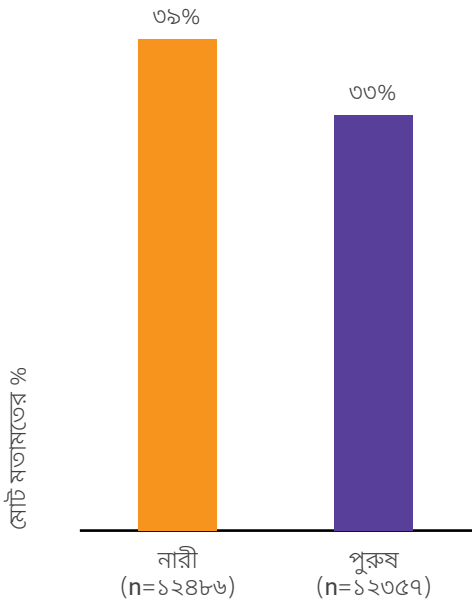

n = বেস

চিত্র ৩: জানুয়ারি ২০১৮ থেকে বিভিন্ন ধরনের কার্ডসংক্রান্ত সমস্যাসমূহ

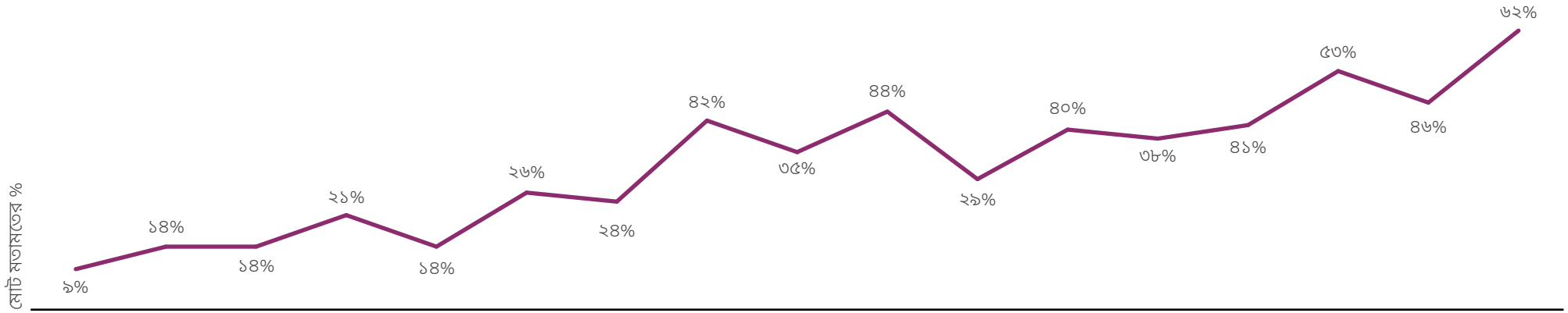

n = বেস

রান্না বিষয়ক সমস্যাসমূহ

সময়ের সাথে সাথে, রোহিঙ্গা জনগণের বিশেষ করে নারীদের, রান্নার জ্বালানি ও রান্নার উপকরণ নিয়ে উদ্বেগ রয়েই গেছে। বিভিন্ন সময়ে এই সমস্যাগুলোর ধরন পরিবর্তিত হয়েছে, প্রথমদিকে রান্নার জ্বালানি নিয়ে চিন্তা ছিলো যা ২০১৯ সালের শুরুতেই কমে যায় অপরদিকে গ্যাস স্টোভ এবং তৎসংশ্লিষ্ট সেবাসমূহের জন্য চাহিদা ও অনুরোধ বেড়েছে।

২০১৮ সালের প্রায় পুরোটা জুড়েই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর একটি অন্যতম উদ্বেগের বিষয় ছিল রান্নার জ্বালানি স্বল্পতা। বর্ষাকালে সমস্যাটি খুব প্রকট হতে দেখা যায় কারণ বৃষ্টির কারণে বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছিল না এবং একইসাথে ভেজা থাকার কারণে কাঠ জ্বালাতেও সমস্যা হচ্ছিল। মানুষের কাছ থেকে জানা যায় যে, প্রথমে সেনাবাহিনী তাদের কাঠের জ্বালানি সরবরাহ করে এবং পরবর্তীতে মানবিক সহায়তা প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থাগুলো এ দায়িত্ব নেয় কিন্তু কাঠ সরবরাহের সংখ্যা কমে যায় এবং তা তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট ছিলো না। আরো অধিক মানুষের মাঝে স্টোভ বিতরণ করা হলে এই অভিযোগগুলোর সংখ্যা দ্রুত কমে আসে, তবে যারা তখনো স্টোভ পাননি তারা তখনো রান্নার জ্বালানি নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন।

রান্নার জ্বালানি সমস্যার সমাধান করতে মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলো গ্যাস স্টোভ ও সিলিন্ডার বিতরণ করা শুরু করেছে। মতামতগুলো থেকে এটা পরিষ্কার যে, মানুষ কাঠের জ্বালানি থেকে গ্যাসের চুলা বেশি পছন্দ করে কারণ এটা ব্যবহার করা সহজ, ধোঁয়া হয় না এবং ব্যবহারের জন্য বেশি জায়গার প্রয়োজন হয় না। যারা এখনও স্টোভ পাননি তারা স্টোভের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছেন, যার কারণে ২০১৯ সাল জুড়ে গ্যাস স্টোভের চাহিদা বেড়ে যায়।

> “গ্যাসের চুলা আর সিলিন্ডার হলো সবচেয়ে ভালো সমাধান। আমাদের যদি কাঠের জ্বালানি দেয়া হয়, আমরা সেগুলো রাখতে পারবো না, আমাদের ঘরে পর্যাপ্ত জায়গা নেই ; আর গ্যাস সিলিন্ডারে ধোঁয়া হয় না।”
>
> – পুরুষ, ৪৯, ক্যাম্প ১০

যারা গ্যাসের চুলা ও সিলিন্ডার নিয়েছেন তাদের ভেতরে, মাস শেষ হওয়ার আগেই গ্যাস ফুরিয়ে যাওয়া এবং লম্বা লাইনের কারণে গ্যাস সিলিন্ডার নেয়ার সমস্যা নিয়ে অভিযোগ রয়েছে।

চিত্র ৪: যারা রান্না সংক্রান্ত সমস্যার কথা বলেছেন তাদের মাঝে শতকরা কতজন রান্নার জ্বালানি ও/অথবা গ্যাস স্টোভ সংক্রান্ত সমস্যার কথা বলেছেন

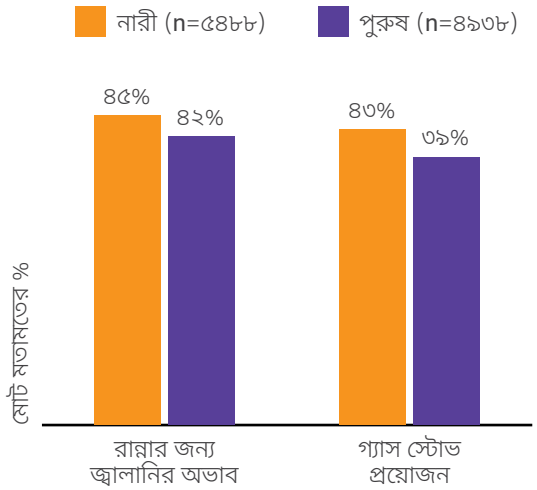

n = বেস

চিত্র ৫: ফেব্রুয়ারি ২০১৮ থেকে রান্না বিষয়ক উদ্বেগসমূহ

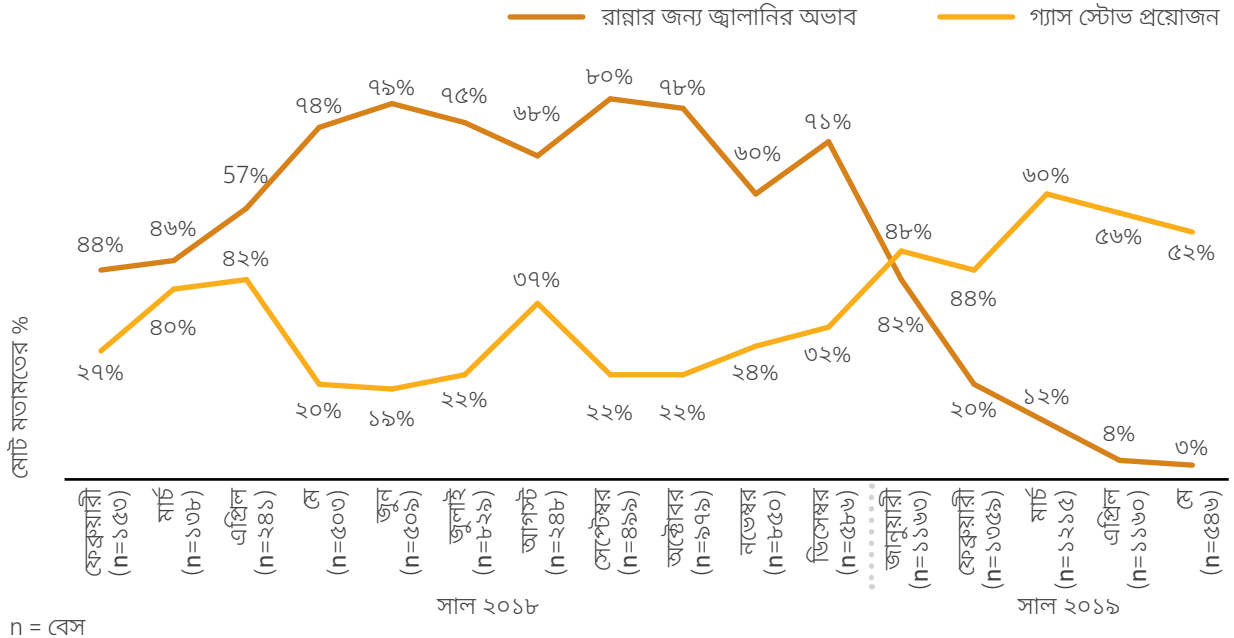

n = বেস

স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গি

স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষদের নিয়ে গবেষণায় দেখা গেছে যে, তারা বন থেকে বাঁশ কেটে স্থানীয় বাজারগুলোতে বিক্রি করত, কিন্তু রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের কারণে বনের বেশ বড় অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এখন তা কঠিন হয়ে পড়েছে। তারা বলছে, রোহিঙ্গা জনগণ অবশিষ্ট বন থেকে কাঠের জ্বালানি সংগ্রহ করছে এবং স্থানীয় লোকজন তাদের কাছে যেতেই ভয় পাচ্ছে।

> *“যখনই আমরা কাজের জন্য বাইরে যাই, রোহিঙ্গা জনগণ আমাদের গালি দেয় এবং চিৎকার করে। আমরা সবসময় তাদের ভয় পাই। ভয়ের কারণে আমরা কাজ বন্ধও রাখি।”*
>
> *– পুরুষ, ৩৫, দিনমজুর*

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা আরো বলেছেন যে, পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা নিয়েও উদ্বিগ্ন। তাদের মতে, বনভূমি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে আশেপাশের এলাকার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।

শেল্টার সংক্রান্ত উদ্বেগ সমূহ

সময়ের সাথে সাথে, শেল্টার নিয়ে যেসব সমস্যা হয় সেগুলোতে পরিবর্তন এসেছে, বর্ষাকাল আসার আগে ২০১৮ ও ২০১৯ এ দুই বছরেই আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত কারণে শেল্টার মেরামত করা নিয়ে অতিরিক্ত উদ্বেগ লক্ষ করা যায়। শেল্টার সংক্রান্ত অন্যান্য উদ্বেগগুলোর মধ্যে রয়েছে নতুন শেল্টারের প্রয়োজনীয়তা, শেল্টারে পর্যাপ্ত জায়গা নেই এবং শেল্টারে বাস করতে হলে ভাড়া দিতে হয় এরকম আশঙ্কা (শেষের উদ্বেগটি বিশেষ করে ক্যাম্প ২৪ এ লক্ষ করা যায়)।

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়কে নিয়ে গবেষণায় দেখা গেছে, তারা মনে করতে পারেন যে যখন তারা প্রথম বাংলাদেশে আসেন তখন তারা শেল্টার তৈরির উপকরণ (যার মধ্যে ছিল বাঁশ, তেরপল ও দড়ি) পেয়েছিলেন। সময়ের সাথে সাথে তাদের শেল্টার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে: বেশিরভাগ তেরপল ছিঁড়ে গেছে, ঘরের চাল তৈরির বাঁশ ভেঙ্গে গেছে, বাঁশের খুঁটিগুলো পচে গেছে। মানুষের চিন্তার আরেকটি কারণ হলো ঝড়ো বাতাসে তাদের শেল্টার ভেঙে যাবে এবং বর্ষাকালে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং বৃষ্টির পানি ঢুকবে। শেল্টার মেরামত করার উপকরণ যেমন তেরপল, বাঁশ ও দড়ির মতো জিনিসের প্রয়োজনীয়তার কথা এই সকল মানুষ জানিয়েছেন। রোহিঙ্গা জনগণকে নিয়ে গবেষণায় দেখা গেছে যে তারা তাদের উদ্বেগের কথা মাঝিদের জানিয়েছেন এবং কিছু কিছু মানুষ এই সব উদ্বেগের কথা এনজিও কর্মী ও সি.আই.সি অফিসে জানিয়েছেন বলেও নিশ্চিত করেছেন, কিন্তু কোন পদক্ষেপ নেয়া হয় নি।

> “ঝড়ের সময় আমাদের থাকার জন্য একটা নিরাপদ জায়গা দরকার। কোথায় আমরা বাঁশ, তেরপল বা পলিথিন পাবো?”
>
> – নারী, ৩২, বালুখালি

চিত্র ৬: যারা শেল্টার সংক্রান্ত সমস্যার কথা বলেছেন তাদের মাঝে শতকরা কতজন শেল্টার মেরামত সংক্রান্ত সমস্যার কথা বলেছেন

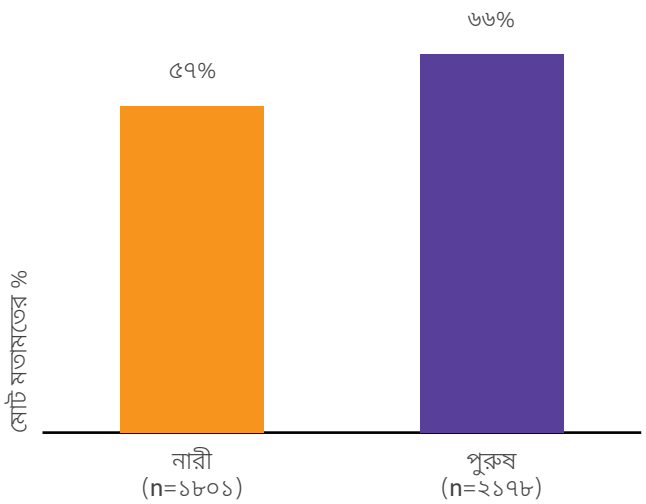

n = বেস

চিত্র ৭: এপ্রিল ২০১৮ থেকে এ পর্যন্ত শেল্টার সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ

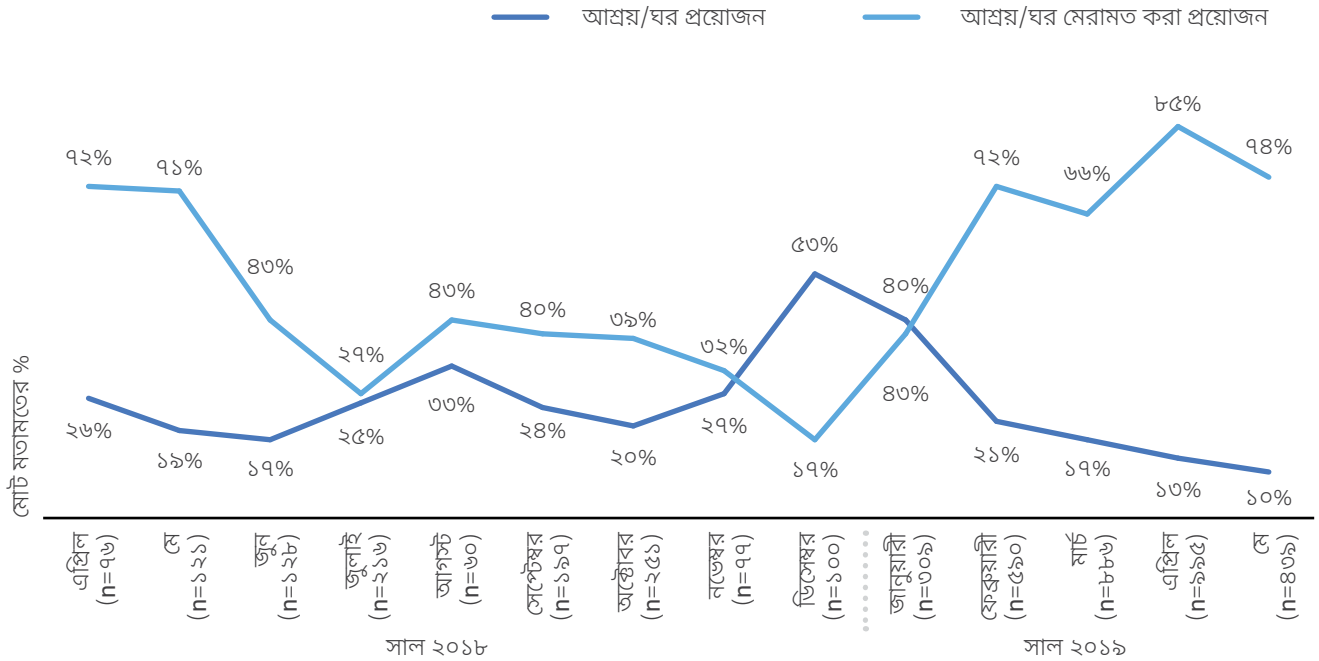

n = বেস

আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীর অভিমত

আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠী থেকে গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরা কৃষি জমিসহ তাদের অন্যান্য জমি হারানোর আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন, কেননা এই জমিগুলো রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের সময় থেকে দখল হয়ে আছে।

> *“রোহিঙ্গা জনগণ আমার জমিতে অস্থায়ী ঘর তৈরি করতে শুরু করলে আমি যদি তাদের নিষেধ করি তাহলে তারা সেনাবাহিনী বা পুলিশকে বলে যে আমি টাকা দাবি করেছি। তখন সেনাবাহিনী বা পুলিশ এসে আমাকে মারধর করতে শুরু করে। এমনকি কোনো প্রকার তদন্ত না করেই তারা আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। আমাদের মনে হচ্ছে আমরা আমাদের নিজেদের জায়গা থেকে বিতাড়িত হয়েছি।”*
>
> *– পুরুষ, পালংখালি, উখিয়া, কক্সবাজার*

পানি সংক্রান্ত উদ্বেগ সমূহ

অনুপ্রবেশের শুরু থেকেই, পানির উৎস, পানির উৎসের স্বল্পতা এবং নষ্ট অকার্যকর পানির উৎস নিয়ে অসংখ্য অভিযোগ পাওয়া যায়। পানি নিয়ে উদ্বেগের হার ২০১৮ সালের শেষের দিকে কমেছে কিন্তু ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে তা আবার বেড়ে যায়।

২০১৮ সালের অক্টোবর ও নভেম্বরে পানির উৎস নিয়ে সমস্যা কমেছিল কিন্তু পানি না পাওয়া নিয়ে অভিযোগ বেশি ছিল। এর কারণ হয়তো শুষ্ক মৌসুমের শুরুতে পানির স্তর নিচে নেমে গিয়েছিল, তাই পানি তুলতে কষ্ট হচ্ছিল। সুতরাং, যদিও তাদের পানির উৎস ছিল, শুষ্ক মৌসুমের কারণে তাদের পানি নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল।

নলকূপ আর ট্যাপের পানিই রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের পানির মূল উৎস। অনেক সময় নলকূপের অবস্থা দেখে মানুষ উদ্বিগ্ন হয়েছেন, যেমন- পানিতে বাজে গন্ধ থাকা অথবা পানিতে আয়রনের পরিমাণ বেশি থাকা। ওই উৎসগুলো থেকে পানি সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হলে, তারা কাছের পুকুর বা প্রাকৃতিক ঝর্ণা থেকে পানি সংগ্রহ করতে যায়।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অনেকেই শেল্টার দাতা জনগোষ্ঠীর সাথে একই নলকূপ ব্যবহার করে, এই ধরনের রোহিঙ্গা ব্যক্তিরা জানিয়েছেন যে, কোনো কোনো জায়গায় শেল্টার দাতা গোষ্ঠী নলকূপের মূল অংশটি খুলে রেখে দেয় যাতে রোহিঙ্গা জনগণ পানি নিতে না পারে। অন্যান্য জায়গায়,তারা বলেছেন যে পানি নিতে গেলে তাদের গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হয়। কিছু মানুষ বলেছেন নলকূপ বারবার মেরামত করার দরকার হয়, তাই তারা যন্ত্রাংশ কেনার টাকার জন্য তাদের ত্রাণসামগ্রী বিক্রি করে দেন।

> “আমাদের দুই থেকে তিন মাস পরপর নলকূপ মেরামত করা দরকার হয়। এই কারণে, যন্ত্রাংশ কেনার জন্য আমরা স্থানীয় দোকানে আমাদের চাল বিক্রি করি।”
>
> – পুরুষ, ক্যাম্প ১৩

পানি সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্যার মধ্যে রয়েছে পানির উৎসগুলো ঘর থেকে অনেক দূরে।

চিত্র ৮: যারা পানি সংক্রান্ত সমস্যার কথা বলেছেন তাদের মাঝে শতকরা কতজন পানির অপ্রাপ্যতা ও/অথবা পানির উৎস সংক্রান্ত সমস্যার কথা বলেছেন

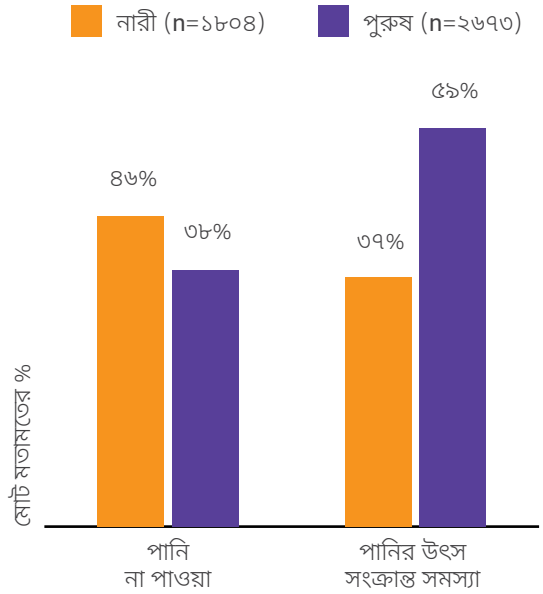

n = বেস

চিত্র ৯: ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে পানি সংক্রান্ত উদ্বেগসমূহ

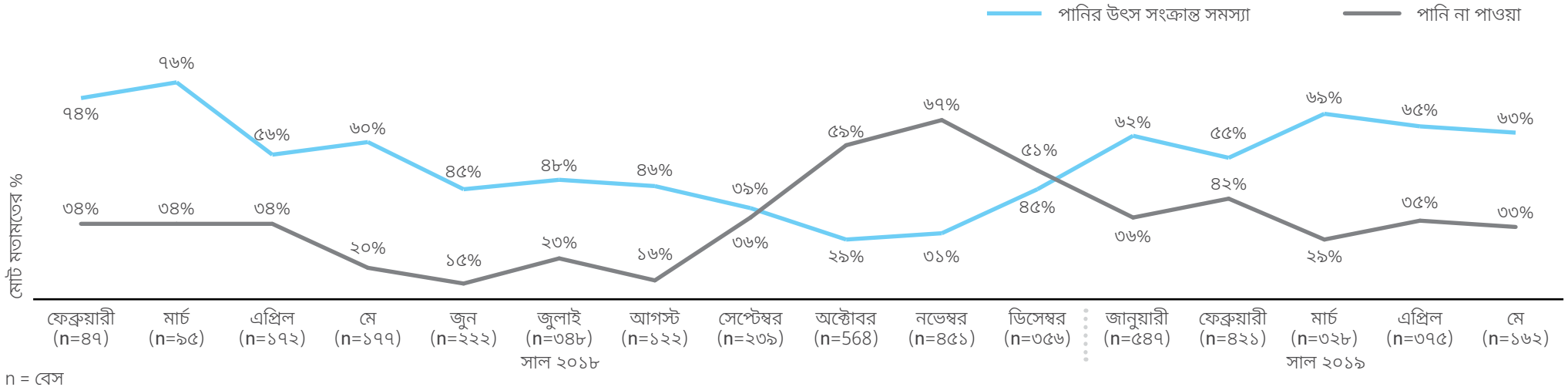

n = বেস

ল্যাট্রিন সংক্রান্ত উদ্বেগ সমূহ

রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের শুরু থেকেই রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের একটি অন্যতম উদ্বেগ ছিল পর্যাপ্ত ল্যাট্রিনের অভাব নিয়ে। যদিও এই বিষয়ে প্রাপ্ত মতামতের সংখ্যা ২০১৮ সালের নভেম্বর থেকে ২০১৯ সালের জানুয়ারির মধ্যে কমে যায় এবং সাম্প্রতিক সময়েও এই সংক্রান্ত উদ্বেগ কম লক্ষ করা যাচ্ছে। ল্যাট্রিনের বাজে অবস্থা নিয়ে ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে উদ্বেগ বেড়েছে।তারা জানিয়েছেন যে অনেক সংখ্যক লোককে মাত্র অল্প কয়েকটি ল্যাট্রিন ব্যবহার করতে হচ্ছে, এগুলো বুজে যাচ্ছে এবং ভেঙে যাচ্ছে। এই সংক্রান্ত উদ্বেগও ২০১৯ সালে কমেছে।

তারা উল্লেখ করেছেন যে, ক্যাম্পে তাদের পর্যাপ্ত ল্যাট্রিন নেই এছাড়াও পুরুষ ও নারীদের জন্য আলাদা ল্যাট্রিনের ব্যবস্থাও নেই। এজন্য নারীদের সকালে আগেভাগে ল্যাট্রিন ও গোসলখানা ব্যবহার করতে হয়, যাতে পুরুষদের সাথে লাইনে দাঁড়াতে না হয়। এছাড়াও, তারা বলেছেন যে অসংখ্য মানুষের ব্যবহারের কারণে ল্যাট্রিনগুলো তাড়াতাড়ি ভরে যায় এবং ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। নারীরা বলেছেন যে রাতে ল্যাট্রিনে যাওয়ার সময় তাদের পরিবারের কোনো পুরুষ সদস্যকে সাথে নিতে হয়, কারণ ল্যাট্রিনগুলো অনেক দূরে এবং তারা অন্ধকারে একা যেতে পারেন না।

> “যখন কোনো পুরুষ আশেপাশের কোনো ল্যাট্রিন ব্যবহার করেন, তখন আমার ল্যাট্রিন ব্যবহার করতে লজ্জা করে। তাই, আমাকে তার চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় এবং তারপর আমি ল্যাট্রিন ব্যবহার করি। ল্যাট্রিনের সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন।”
>
> – নারী, ২৫, ক্যাম্প ২

কোনো কোনো পরিবারের পুরুষরা ঘরের কাছাকাছি একটি গর্ত খুঁড়ে বা ঘরের কোনো একটি কোণ জরুরি প্রয়োজনে ল্যাট্রিন হিসেবে ব্যবহার করেন, কিন্তু এই ব্যবস্থা নারীরা ব্যবহার করতে পারেন না। ক্যাম্পে কেবলমাত্র নারীদের ব্যবহারের জন্য গোসলখানার অভাব রয়েছে অর্থাৎ গোসল করা বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে নারীরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

রোহিঙ্গা নারীরা বলেছেন যে, মাসিকের সময় তাদের প্রতিদিনকার সমস্যাগুলো আরো বেশি হয়, এবং তাদের পর্যাপ্ত প্যাড, কাপড় ও সাবানের প্রয়োজন। নারীরা বলেছেন, তাদের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সমস্যা হয় কারণ তাদের বোরখা পড়ে ল্যাট্রিনে যেতে হয় এবং তাদের যথেষ্ট সাবান থাকে না, কারণ তারা স্যানিটারি প্যাড হিসেবে ব্যবহার করা কাপড়গুলো ধুতে গায়ে মাখার সাবান ব্যবহার করতে পারেন না। নারীরা আরো বলেন যে তাদের কাপড় শুকানোর জন্য পর্যাপ্ত জায়গা নেই, এজন্য তাদের কাপড় শুকাতে সাধারণত দুইদিন লাগে। কখনও কখনও তারা অর্ধেক ভেজা কাপড় পরেন, যার কারণে স্বাস্থ্যগত নানা সমস্যা তৈরি হতে পারে।

> “জায়গা ছোট হওয়ার কারণে, মাসিকের সময়টাতে কাপড় শুকাতে আমাদের অনেক সমস্যা পোহাতে হয়। এই কাপড়গুলো শুকাতে প্রায় দুই দিন লাগে। মাঝেমাঝে আমাদের আধভেজা কাপড় পড়তে হয় ফলে আমাদের গোপনাঙ্গে স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন সমস্যা হয়।”
>
> – নারী, ১৮, ক্যাম্প ২

চিত্র ১০: যারা ল্যাট্রিন সংক্রান্ত সমস্যার কথা বলেছেন তাদের মাঝে শতকরা কতজন ল্যাট্রিনের খারাপ অবস্থা ও/বা ল্যাট্রিনের অভাব সংক্রান্ত সমস্যার কথা বলেছেন

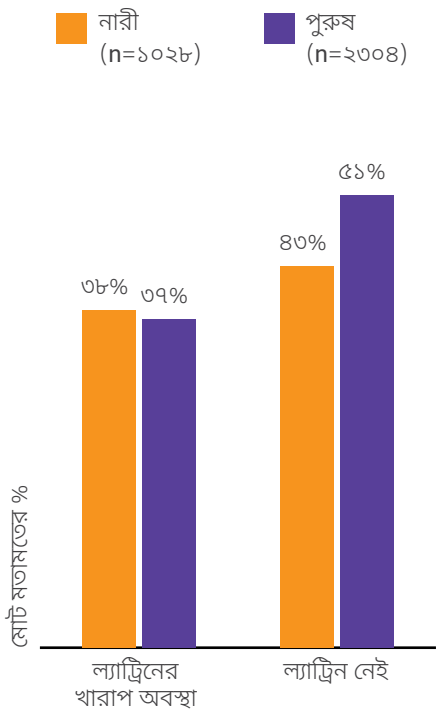

n = বেস

চিত্র ১১: এপ্রিল ২০১৮ থেকে এ পর্যন্ত ল্যাট্রিনর সমস্যা সংক্রান্ত উদ্বেগসমূহ

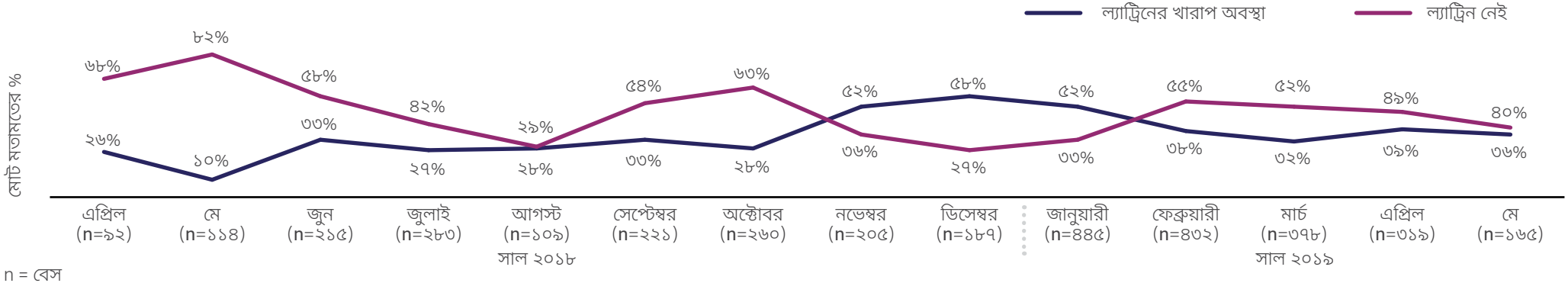

n = বেস

সাইট-সংক্রান্ত উদ্বেগ সমূহ

ডিসেম্বর ২০১৮ থেকে রাস্তা ও ব্রিজ মেরামত করা, পানি-নিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা এবং ক্যাম্পে ওঠার সিঁড়ি মেরামতের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি সাইট-সংক্রান্ত উদ্বেগগুলো বেড়েছে, অপরদিকে রাস্তায় বাতি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত উদ্বেগ কমেছে।

২০১৮ সালের আগস্ট মাসে ব্রিজ ও রাস্তা সংক্রান্ত সমস্যাগুলো নিয়ে উদ্বেগ সবচেয়ে বেশি ছিল আর ডিসেম্বরে এ সংক্রান্ত উদ্বেগ সবচেয়ে কম ছিল। ২০১৯ সালে এ সমস্যা আবার বাড়তে দেখা যায় এবং সবচেয়ে বেশি সমস্যা সংক্রান্ত উদ্বেগ দেখা যায় মার্চ মাসে। রাস্তায় বাতির চাহিদা সবচেয়ে বেশি ছিলো ২০১৮ সালের মার্চ মাসে কিন্তু নভেম্বরে হঠাৎ করে উদ্বেগ বৃদ্ধি বাদ দিলে, তার পর থেকেই এ সংক্রান্ত উদ্বেগ কমছে। নালা ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও সিঁড়ি সংক্রান্ত অন্যান্য উদ্বেগগুলো ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০১৯ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সর্বোচ্চ ছিলো।

গুণগত গবেষণায় দেখা গেছে, রাস্তা ও সিঁড়ির কারণে দুর্ঘটনা ঘটছে বলে রোহিঙ্গা জনগণ তাদের উদ্বেগের কথা ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেছে যে, ক্যাম্পের ভেতরের রাস্তা ভাঙাচোরা এবং বৃষ্টি হলে রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে যায়। এই রাস্তায় নারীরা পানি আনতে গিয়ে পিছলে পড়ে যায় এবং ব্যথা পায়। তারা এটাও বলেছে ভাঙা সিঁড়ি নড়াচড়া করে যা বয়স্ক মানুষ, নারী ও শিশুদের জন্য বিপজ্জনক। কিছু অংশগ্রহণকারী বলেছেন যে মসজিদে যাওয়ার পথে কোনো সিঁড়ি নেই, এজন্য সেখানে যাওয়া বেশ কষ্টকর। তারা এই অভিযোগও করেছে যে, সিঁড়ি বানানোর বস্তাগুলো ছিঁড়ে গেছে এবং এতে চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে।

> “প্রধান সড়কে ইটের তৈরি কিন্তু ক্যাম্পের ভেতরের রাস্তাগুলো মাটির তৈরি আর ভাঙাচোরা। বৃষ্টি হলে রাস্তাগুলো খুব পিচ্ছিল হয়ে যায়। অনেক নারী রাস্তা দিয়ে পানি আনার সময় পিছলে পড়েছেন এবং হাত ভেঙেছেন বা ব্যথা পেয়েছেন।”
>
> – পুরুষ, ক্যাম্প ১২

তারা আরো বলেছে যে, কোথাও কোথাও আলোর ব্যবস্থা নেই, বা লাইট থাকলেও লাইট জ্বলে না ফলে রাতে চলাচল খুব কষ্টকর হয়ে ওঠে। তারা আরো বলেছে যে, শেল্টার স্থলের কাছের নালাগুলো ভর্তি হয়ে আছে এবং দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। যাদের ঘর নালাগুলোর কাছে তারা বলেছেন বৃষ্টির সময় নালার পানি উপচে তাদের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তারা সমস্যাগুলো মাঝিদের, এন.জি.ও-দের এবং সি.আই.সি কে জানিয়েছে কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

চিত্র ১২: যারা সাইট সংক্রান্ত সমস্যার কথা বলেছেন তাদের মাঝে শতকরা কতজন ব্রিজ ও রোড মেরামত, নালা ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, সড়কবাতি ও/অথবা সিঁড়ি সংক্রান্ত সমস্যার কথা বলেছেন

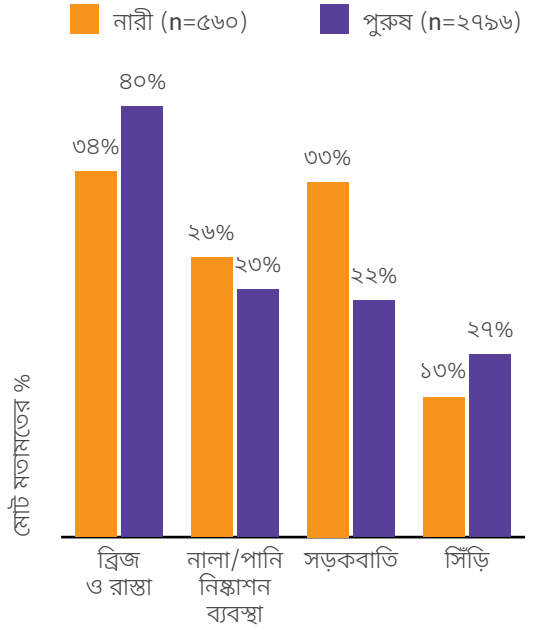

n = বেস

চিত্র ১৩: মার্চ ২০১৮ থেকে সাইটের বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত উদ্বেগসমূহ

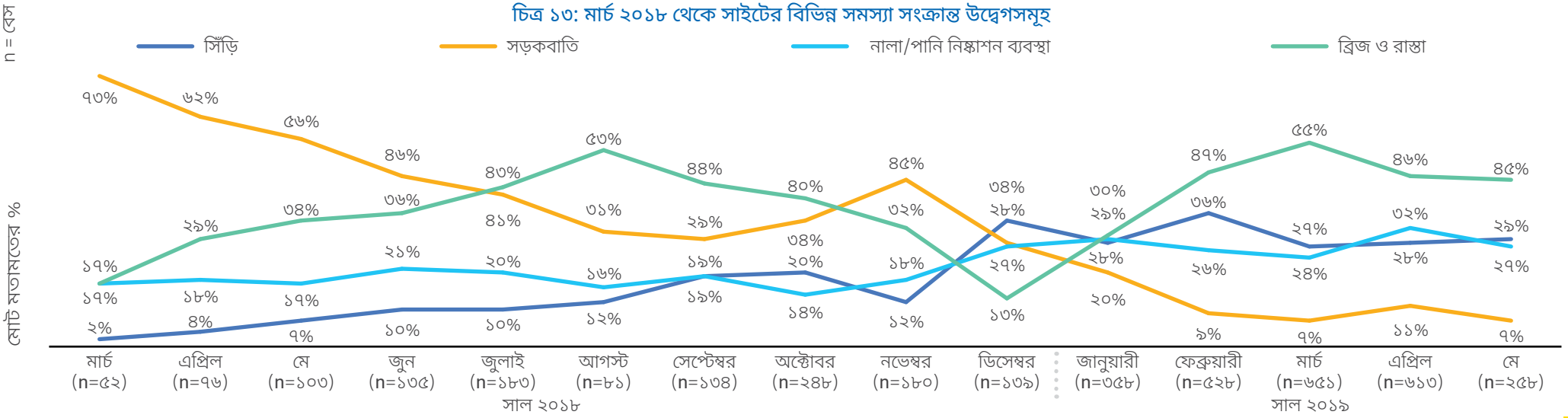

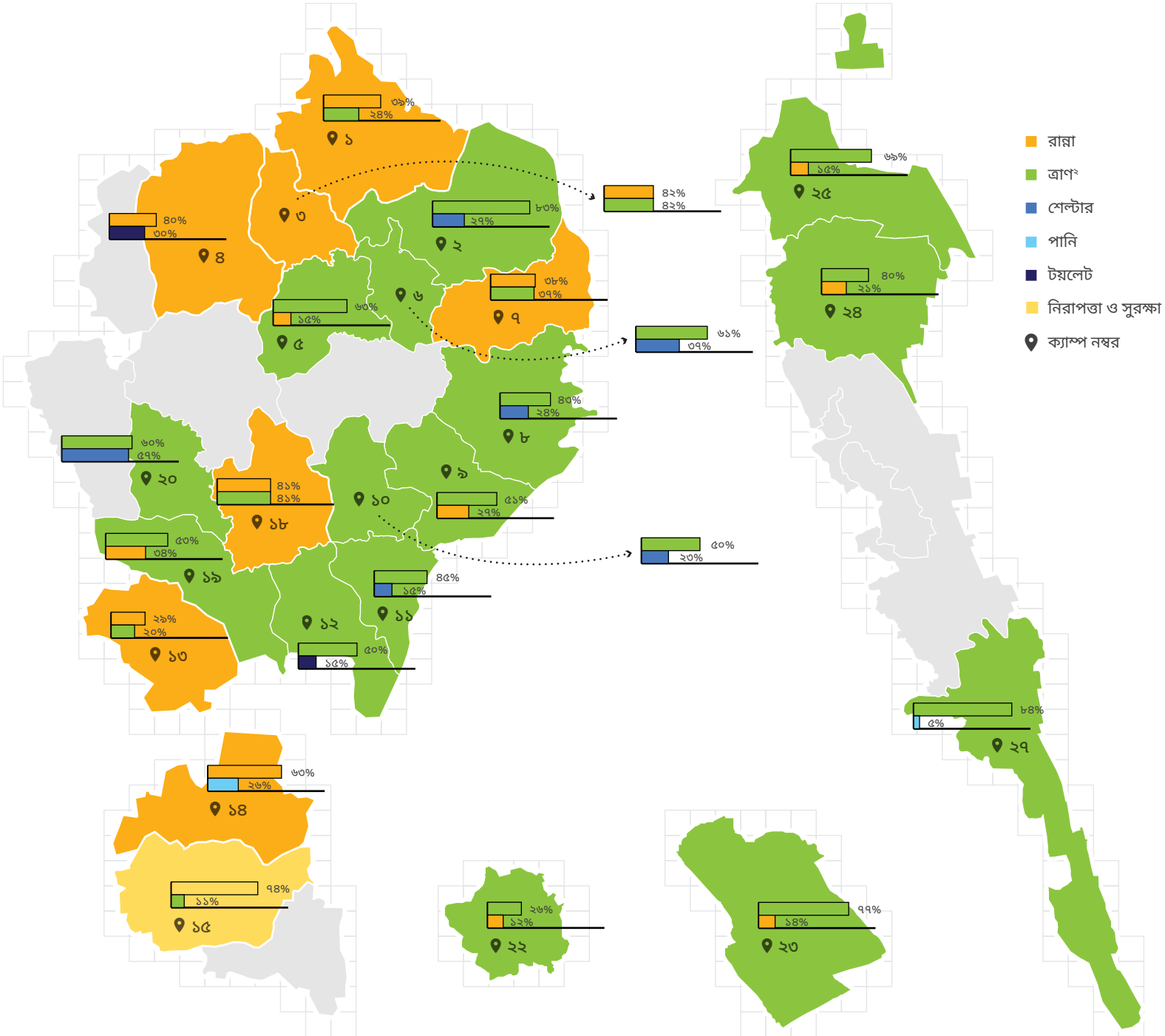

সূত্র: জানুয়ারি ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ২৭টি ক্যাম্প থেকে (ক্যাম্প ১ থেকে ক্যাম্প ২৭ পর্যন্ত ক্রমানুসারে) অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ, এ.সি.এফ, ডি.আর.সি, হেল্প এজ ইন্টারন্যাশনাল, আই.ও.এম এবং সলিডারিটিজ ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক ৬৪,৮৪৪ জন রোহিঙ্গা ব্যক্তির মতামত সংগ্রহ করা হয়। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য ব্র্যাকের ৮০০ জন স্বেচ্ছাসেবক কর্তৃক ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলা থেকে জনগোষ্ঠীর গুণগত মতামত সংগ্রহ করা হয়। বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন কর্তৃক আগস্ট ২০১৮ থেকে জুলাই ২০১৯ এর মধ্যে ক্যাম্প ১,২,৯,১০,১২,১৩ ও ২৪ এ বিস্তারিত সাক্ষাৎকার ও ফোকাস দল আলোচনা পরিচালনা করা হয়। বেতার সংলাপ (আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীর জন্য রেডিওতে আলোচনা সভা) ফেব্রুয়ারি ২০১৮ থেকে মার্চ ২০১৯ এর মধ্যে পরিচালনা করা হয়।

তথ্যসমূহের সারসংক্ষেপ[১]

যে সকল ব্যক্তি মতামত দিয়েছেন তাদের লিঙ্গ (সংখ্যা = ৫১, ৫০১)

৫৫% ৪৫%

ক. বয়স অনুযায়ী লিঙ্গ বিভাজন
খ. মতামত প্রদানকারীদের বয়স

	ক (N = ৪৩,৩৮৪)		খ (N = ৪৩,৪১৫)
	পুরুষ	নারী	
১৮ এর নিচে	৪৩%	৫৭%	২%
১৮-৪০	৫১%	৪৯%	৬৯%
৪০-৬০	৫৭%	৪৩%	২৫%
৬০ এবং তার উপরে	৬৭%	৩৩%	৪%

ক্যাম্প #	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৮	১৯	২০	২২	২৩	২৪	২৫	২৭
বেস	৮৫০	১০৬৬০	৬৮৪	২১৬	৩৭৪৪	৬৩৬	৪৯৬	৭৩৩৬	২৬৬৭	৪৫২৮	২৮৫৮	২০৬২	৯৮২	৮১৭	৪৯১	৫২১৮	৩০২৩	২০৯৭	৩১১৫	৪১০১	৬১১৭	৮৯১	৬৬৪

১. কিছু মতামতে, মতামত প্রদানকারীর বয়স ও/বা লিঙ্গ উল্লেখ করা নেই। বিশ্লেষণের জন্য কোন কোন দিক বিবেচনায় নেয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে একারণে মোট মতামতের সংখ্যা ভিন্ন হতে পারে।

২. 'ত্রাণ' অর্থে খাদ্যজাতীয় দ্রব্য এবং খাদ্য ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্যও বোঝায়। যেমন- হাইজিন কিট।

ক্যাম্পে ওষুধ প্রদান করার ব্যবস্থাপত্র বা প্রেসক্রিপশন

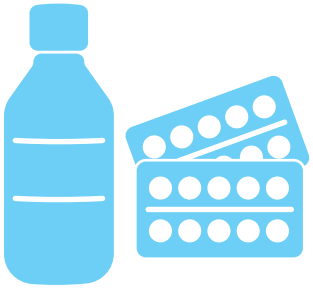

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা সম্প্রদায় স্বাস্থ্য ও ওষুধের ক্ষেত্রে যে ধরনের ব্যবস্থার সাথে পরিচিত তা বাংলাদেশের ক্যাম্পগুলোতে ভিন্ন হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বসবাসকারী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষার হার অত্যন্ত নিম্ন। এর সাথে মোটের ওপর তাদের মধ্যে শিক্ষার হারও নিম্ন, ফলে ক্লিনিক ও হাসপাতাল থেকে যেভাবে ওষুধ গ্রহণ করতে নির্দেশনা দেয়া হয় তা তাদের কাছে সঠিকভাবে বুঝিয়ে বলা আরো কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং করে তুলেছে। টি.ডব্লিউ.বি-এর গবেষণায় দেখা যায় যে অধিকাংশ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে (৭১%) কীভাবে প্রেসক্রিপশন বা ব্যবস্থাপত্র ব্যবহার করতে হবে তা রোগীকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য স্বাস্থ্যক্ষেত্রের দোভাষী বা কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও, অনেক দোভাষী চাটগাঁইয়া বা চাটগাঁইয়া ও বাংলা মিশিয়ে ব্যবস্থাপত্রের তথ্য ব্যাখ্যা করেন, যা বুঝতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষদের সমস্যা হয়।

মিয়ানমারে ওষুধ

মিয়ানমারে, রোহিঙ্গা জনগণ সরকারি হাসপাতালে খুব কমই চিকিৎসা নিত, কারণ তারা দুর্ব্যবহারের ভয় পেত। এছাড়াও সাধারণত হাসপাতালগুলো ছিল রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের গ্রামগুলো থেকে অনেক দূরে। মিয়ানমারে অসুখের সময় তারা ওঝা (বৈদ্য), কবিরাজ (হাকিমি ডাক্তর/ফাইশাদা ডাক্তর) বা মেডিক্যাল প্রাকটিশনার (ফারাইল্লা ডাক্তর) দের কাছে যেত। মেডিক্যাল প্রাকটিশনারদের কিছু ডাক্তারি শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ আছে, কিন্তু তারা লাইসেন্সপ্রাপ্ত চিকিৎসক নন। মেডিক্যাল প্রাকটিশনাররা মাঝে মাঝে রোগীদের ইনজেকশন (ইন্ডিশিন) দিয়ে থাকেন। তারা ট্যাবলেট (বরি) বা খাওয়ার অন্যান্য ওষুধ যেমন সিরাপ (হাইবার ফাইন্না দাবাই) এর প্রেসক্রিপশন কমই দিয়ে থাকেন।

রোহিঙ্গা জনগণ সাধারণত শেষ ভরসা হিসেবে সরকারি হাসপাতালে যেত। তারা সেখানে তখনই যেত যখন বৈদ্য বা স্থানীয় মেডিক্যাল প্রাকটিশনারদের চিকিৎসায় কাজ হতো না, বা আস্তে আস্তে তাদের অবস্থা আরো খারাপ হতো। মিয়ানমারে চিকিৎসা ব্যয়বহুল ছিল। সামর্থ্য থাকলে তারা প্রাইভেট ফার্মেসিতে (দাবাইয়ের দুয়ান) ওষুধ নিতে যেত।

ক্যাম্প থেকে ওষুধ নেয়া

ক্যাম্পে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের জন্য অনেক ধরনের স্বাস্থ্য সেবা রয়েছে, যেমন মাঠপর্যায়ের হাসপাতাল থেকে ছোট ছোট স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বা ক্লিনিক পর্যন্ত। সেবাসমূহের এই সহজলভ্যতার কারণে, তারা মিয়ানমারে থাকতে ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছ থেকে যতটা স্বাস্থ্য পরামর্শ নিত এখন তার থেকে অনেক বেশি এ ধরনের পরামর্শ নিচ্ছে। যাই হোক, রোহিঙ্গা জনগণ ব্যক্তিগত ফার্মেসিতে যেত ওষুধের (দাবাই) জন্য, কেউ কেউ মনে করে মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুলো বিনামূল্যে যে সেবাগুলো দেয় তা কম কার্যকর। এর ফলে প্রেসক্রিপশনে যে ওষুধগুলো খাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে তার কার্যকারিতা সম্পর্কে অনাস্থা তৈরি হতে পারে।

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের কেউ কেউ বলেছে যে তারা যখন মিয়ানমারে ছিলো ডাক্তাররা তাদের বেশিরভাগ সময়ই তাদের ইনজেকশন দিতেন। তাই বাংলাদেশে ডাক্তাররা যখন ট্যাবলেট বা তরল ওষুধের প্রেসক্রিপশন দেন, তারা সন্দেহ করে যে ওষুধে কাজ করবে না।

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য পরামর্শ দেয়ার সময় ডাক্তাররা, রোগীদের কাছ থেকে রোগের লক্ষণ জানার জন্য সাধারণভাবে প্রচলিত বাংলা শব্দ ‘সমস্যা’ (প্রবলেম) ব্যবহার করেন। রোহিঙ্গা ভাষায় এর সমার্থক শব্দ হলো মোশকিল। যাই হোক, মোটের ওপর দুটি শব্দই সাধারণত ব্যবহৃত হয় কোনো কিছুর সমস্যা বোঝাতে যেমন সরঞ্জামের ত্রুটি বোঝাতে, তাই কিছু রোগীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে শব্দটির ব্যবহার বিভ্রান্তিকর হতে পারে। রোহিঙ্গা ভাষায় অনোত্তু গাত কেন লাগেরদে? (“তোমার শরীরে কেমন লাগছে ?”) ব্যবহার করা রোগীদের সাথে সাক্ষাতের সময় বেশি কার্যকর হতে পারে।

কোনো ফার্মাসিস্টের সাথে পরামর্শ করা

ডাক্তারের সাথে পরামর্শের পরে, কোনো রোহিঙ্গা রোগীকে যে প্রেসক্রিপশন দেয়া হয় তা সাধারণত বাংলা বা ইংরেজিতে লেখা হয়। সহযোগী স্বাস্থ্যসেবাদাতাদের মধ্যে বেশিরভাগ (৭১%) ইংরেজিতে প্রেসক্রিপশন ব্যবহারের নিয়ম লেখেন বলে জানিয়েছেন, যদিও ক্যাম্পে ইংরেজি জানার হার খুবই কম। এর থেকে অনেক কম হারে (১৪%) বার্মিজ ও বাংলায় লিখে থাকেন, আর বাকি ১৪% কিছুই লেখেন না। নির্দেশনাগুলো ফার্মাসিস্ট বা স্বাস্থ্যকর্মীরা চাটগাঁইয়া বা রোহিঙ্গা ভাষায় ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন। যাই হোক, স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে আসার পর তাদের কাছে লিখিত কোনো নির্দেশনা বা ব্যবস্থাপত্র থাকে না।

যখন টি.ডব্লিউ.বি রোগীদের জিজ্ঞাসা করে যে কীভাবে ওষুধ গ্রহণ করতে হবে তা তারা বুঝতে পেরেছে কী না (বের হয়ে যাওয়ার সময় নেয়া সাক্ষাৎকারে), তখন সাক্ষাৎকার প্রদানকারী রোহিঙ্গা জনগণের ৫৬% বলেছে যে তারা ”খুবই সামান্য” বুঝতে পেরেছে যে কীভাবে ওষুধ গ্রহণ করতে হবে। কিছু (২৬%) বলেছে যে তারা “পুরোপুরি” বুঝেছে, আর ১৪% বলেছে যে তারা একদমই বোঝেনি যে কীভাবে ওষুধ খেতে হবে।

যখন তারা কীভাবে ওষুধ খাবে তা বুঝতে পারেনা, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কোনো শিক্ষিত ব্যক্তির কাছ থেকে সাহায্য নিতে পছন্দ করে। কিছু মানুষ বলেছে যে তারা কোনো এন.জি.ও কর্মীকে জিজ্ঞাসা করে এবং কেউ কেউ বলেছে যে তারা সাহায্যের প্রয়োজন হলে আবার ক্লিনিকে যায়। যাই হোক, যখন নির্দেশনাগুলো অস্পষ্ট হয় তখন তাদের কেউ কেউ ভুলভাবে ওষুধ খায় বা ওষুধ খাওয়া একদমই বন্ধ করে দেয়। তারা এটাও বলেছে যে মানবিক

স্বাস্থ্য সহায়তা প্রদানকারী কোনো কেন্দ্রের দেয়া প্রেসক্রিপশন বুঝতে না পেরে তাদের ব্যক্তিগত ফার্মেসি বা ক্লিনিকে যেতে হতে পারে।

রোগীকে খাওয়ার পর ওষুধ খেতে হবে এ কথা বোঝানোর জন্য অনেক স্বাস্থ্যকর্মী হাইদ্দো, চাটগাঁইয়া উচ্চারণে একটি বাংলা শব্দ যার অর্থ "খাদ্য"। এর সমার্থক রোহিঙ্গা শব্দ হচ্ছে হানা। এক্ষেত্রে বাত ("ভাত") শব্দটিও ব্যবহার করা যেতে পারে, কারণ রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের প্রধান খাবার ভাত।

ওষুধের মাত্রা সম্পর্কে বলার ক্ষেত্রে, সামিস হচ্ছে "চামচ" এর সমার্থক রোহিঙ্গা শব্দ। বরি হচ্ছে "ট্যাবলেট" এর সমার্থক শব্দ। যদিও অনেক স্বাস্থ্যকর্মী বাংলা শব্দ "সময়" বোঝাতে, বেলা শব্দটি ব্যবহার করেন, রোহিঙ্গা জনগণ ইংরেজি শব্দ "টাইম" ভালো বুঝতে পারেন।

ছবি ব্যবহার করে

একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার সময় মুখে বলা পরামর্শের ৪০–৮০% তথ্যই মানুষ প্রায় সাথে সাথেই ভুলে যায়। চাটগাঁইয়া ও রোহিঙ্গা শব্দভাণ্ডারের পার্থক্য এবং স্বাস্থ্য ও সার্বিক শিক্ষার হার কম হওয়ার কারণে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাথে যোগাযোগের এই বাধা আরো বেড়ে যায়।

টি.ডব্লিউ.বি এর গবেষণায় দেখা যায়, ৬৪% সহযোগী স্বাস্থ্যসেবাদাতা প্রেসক্রিপশন বা ব্যবস্থাপত্র ব্যাখ্যা করে বোঝানোর জন্য কোনো ধরনের সহায়ক ছবি বা চিত্রলিপি ব্যবহার করে না। কিছু সহযোগী স্বাস্থ্যসেবাদাতা প্রেসক্রিপশন অধিক ভালোভাবে বোঝানোর জন্য চিত্রলিপি ব্যবহার করে। এই চেষ্টাগুলো খুবই উপকারী, কিন্তু সংস্থাগুলো রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য যোগাযোগের বিশেষ চাহিদা ও পছন্দ অনুযায়ী এগুলোকে রোহিঙ্গা জনগণের উপযোগী করে তোলে না। এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় ধরে, সঠিক সময়ে ওষুধ খাওয়া হচ্ছে তা নিশ্চিত করা যেতে পারে যার প্রভাব ক্যাম্পে পরিচালিত স্বাস্থ্যসংক্রান্ত কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে। গবেষণা ও নিরীক্ষার মাধ্যমে টি.ডব্লিউ.বি সহযোগী স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে ছবি ব্যবহারের পদ্ধতি তৈরি করার পরামর্শ দিচ্ছে।

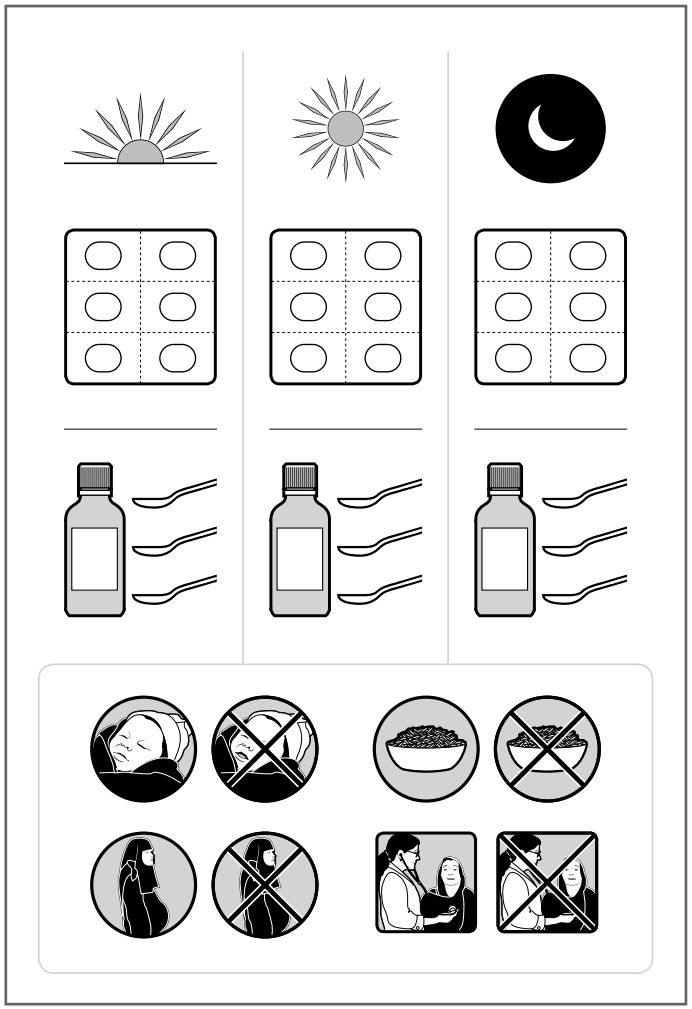

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন, ইন্টারনিউজ এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটি আই.ও.এম, জাতিসংঘ অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় করা হচ্ছে এবং এটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'*যা জানা জরুরি*' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।